বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৪
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকী
মোঃ আনসার উদ্দিন আনাস

বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১৪
অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ড. তাসনিম সিদ্দিকী
মো: আনসারউদ্দিন আনাস

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১৪: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ড. তাসনিম সিদ্দিকী/ রামরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিবাসন বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতিতে সামষ্ঠিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা (BBS, 2014; RMMRU-SDC, 2014) বাংলাদেশের ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অভিবাসনের যে সুদূর প্রবাসী প্রভাব তা তুলে ধরেছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অভিবাসী পরিবারসমূহের দারিদ্রসীমার হার বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্রসীমার চেয়ে প্রায় ১৩% কম (RMMRU-SDC, 2014)। দারিদ্র বিমোচন হতে শুরু করে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন, সর্বক্ষেত্রে অভিবাসন সেক্টরকে সংগঠিত করা, দেশের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে একে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যে কোন সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। প্রতি বছরের মত এ বছরও রামরু বাংলাদেশের অভিবাসন সেক্টরের অর্জন, সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলোকে নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করেছে।

১. বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১৪

১.১ পরিসংখ্যান

২০১৪ সালে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এবছর অভিবাসন মাত্র ১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালের তুলনায় এখনও এ বছরের অভিবাসীর সংখ্যা ৩২% কম। বাংলাদেশ হতে সর্বোচ্চ শ্রম অভিবাসন ঘটেছিল ২০০৮ সালে। ঐ বছর আট লক্ষের ওপর স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে বৈশ্বিক মন্দার কারণে তা অনেকটাই হ্রাস পেয়ে প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। পরবর্তী দুই বছর অর্থ্যাৎ ২০১১ এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন পূর্ববর্তী বছরে তুলনায় কিছুটা বাড়তে থাকে। ২০১২ সালে মোট অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬,০৭,৭৯৮। ২০১৩ সালে মোট অভিবাসন করেন ৪,০৯,২৫৩ জন। ২০১৪ সালের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল ৪,১১,০০০ জন।

বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৬ সাল হতে এ বছরে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৯০ লক্ষের অধিক লোক কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেছেন। কিন্তু এর ভেতর হতে চুক্তির মেয়াদ শেষ করে কতজন দেশে ফিরে এসেছেন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কোন কার্যক্রম না থাকায় বর্তমানে কতজন বাংলাদেশী বিদেশে কর্মরত রয়েছেন তা জানার কোন উপায় নেই। তবে কোন অবস্থাতেই এটা ভেবে নেয়া ঠিক নয় যে, এই ৯০ লক্ষ লোক যারা বিএমইটি'র ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন তাদের সকলেই এখনো বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশ হতে বছরভিত্তিক অভিবাসনের চিত্র নিম্নের গ্রাফ হতে দেখা যাচ্ছে।

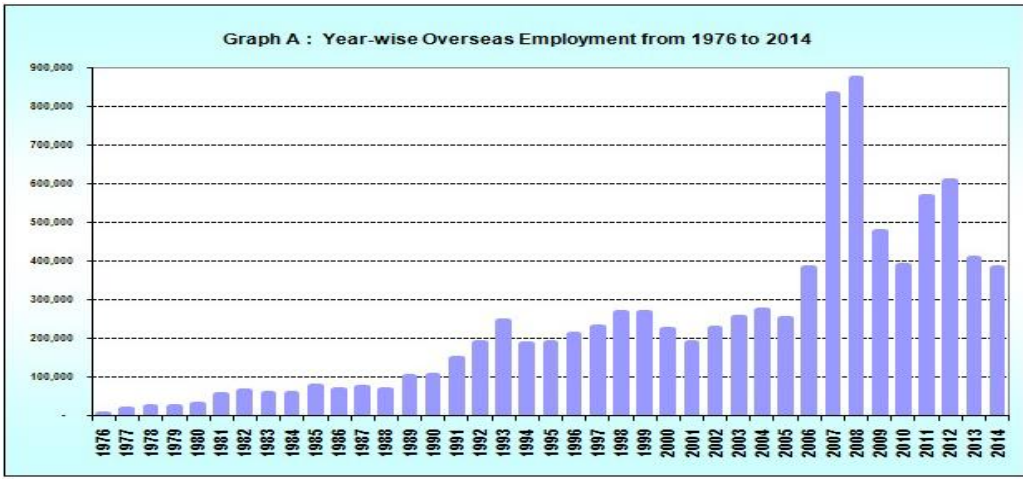

চিত্র: ১৯৭৬ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন

১.২ নারী অভিবাসন ২০১৪

২০১২ সাল হতে পুরুষ অভিবাসনের তুলনায় নারী অভিবাসন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৭,৫৮৩ জন নারী অভিবাসী বিদেশে গিয়েছেন যা মোট অভিবাসীর প্রায় ১৭.৭০%। সে হিসেবে ২০১৪ সালকে আমরা নারী অভিবাসনের বছর হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৫৬,৪০০ এবং মোট অভিবাসনের ১৩.৭৮%। বিএমইটি'র প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮৪৫ জন নারীকর্মী বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেছেন লেবাননে, ৮৯ হাজার ৮৮১ জন। পুরুষ শ্রমিক অভিবাসনে সীমাবদ্ধতার কারণে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নারী অভিবাসনের দিকে জোর দিচ্ছে।

১.৩ গন্তব্য দেশঃ

বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসন করেন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০১৪ সালে মোট অভিবাসীর প্রায় ৮৪% মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছেন। ১৯৭৬ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসনের হার মোট অভিবাসনের প্রায় ৮২ভাগ। দক্ষিনপূর্ব এশিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে এ অভিবাসনের হার ১৮ ভাগ। মধ্যপ্রাচ্যে সর্বোচ্চ অভিবাসন ঘটে ১৯৯১ সালে প্রায় ৯৭.৩০% এবং সর্বনিম্ন ২০০৭ সালে ৫৮.১০%। ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করেছেন ওমানে। এ বছরের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ১,০১,৮৮২ জন কর্মী গিয়েছেন, যা এ বছরের মোট প্রেরিত কর্মীর ২৪.৮৫% ভাগ। ২০১৪ সালে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাতার। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ৮৪,৭০৯ জন কর্মী গেছেন, যা মোট প্রেরিত কর্মীর ২০.৬৬% ভাগ। গত বছরের তুলনায় কাতারে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ৬.৫ ভাগ বেশী। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৩,৫১৬ জন কর্মী গ্রহন করে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। এ বছর সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণ গত বছরের চেয়ে ২.২% কম, যা মোট অভিবাসনের ১৩.০২ ভাগ। মালয়েশিয়াতে এবছরে জিটুজি'র অধীনে মাত্র ৫১৯১(১.২৬%) জন কর্মী গিয়েছেন।

বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের শ্রমবাজার সৌদি আরবে পুন:প্রবেশের ক্ষেত্রেও কোন অগ্রগতি হয়নি। এ বছর দেশটিতে মাত্র ১০,৪৭৮ জন কর্মী অভিবাসন করেছেন, যা মোট অভিবাসনের মাত্র ২.৬২%। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার কর্তৃক বাংলাদেশী পুরুষ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপের পর

থেকে দেশটিতে অভিবাসনের হার একেবারেই কমে এসেছে। ২০১৪ সালের ২২ এ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে মাত্র ২৩,৩৭৭ জন কর্মী অভিবাসন করেছেন, যা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্ববর্তী সময়কালের চেয়ে প্রায় ৯০ ভাগ কম। লক্ষ্যণীয়, এই ২৩,৩৭৭ জন কর্মীর মধ্যে প্রায় ৮৯ ভাগই নারী কর্মী।

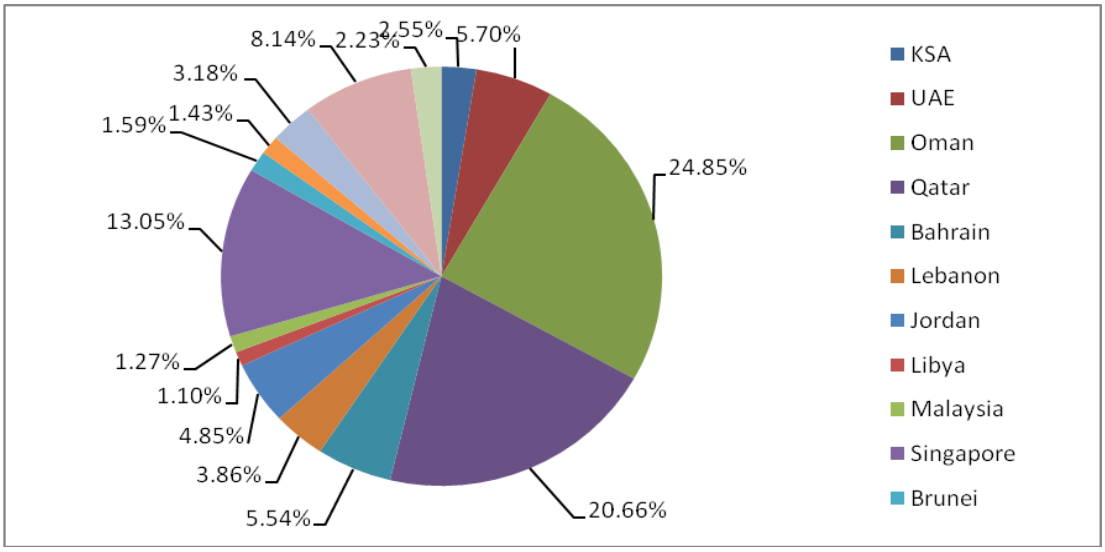

চিত্র: ২০১৪ সালে বাংলাদেশ হতে প্রেরিত অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশসমূহ

২০১৪ সালে নারী অভিবাসী কর্মীদের প্রধান গন্তব্য দেশ ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত (৩০.৫৮%) এবং তারপরেই রয়েছে জর্ডান (২৭.২৭%)। ২০১৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নারী অভিবাসন প্রায় ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরে রয়েছে লেবানন ১৫.৫৯%, ওমান ১৪.৯৩%, কাতার ৮.৩৭% মরিশাস ২.৬৪%। এ বছর ওমান এবং কাতারে নারী কর্মীর সংখ্যা গত বছরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও সিঙ্গাপুর, হংকং, মরিশাসের মত অপ্রচলিত দেশেও নারী অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

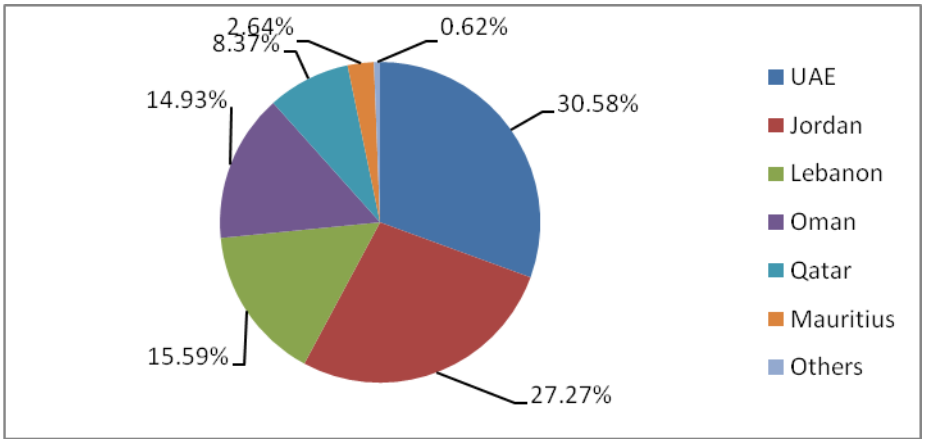

চিত্র: ২০১৪ সালে বাংলাদেশ হতে প্রেরিত নারী অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশসমূহ

সাম্প্রতিক বছরগুলোর মত এ বছরও বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন বিশ্লেষনে আরেকটি ভাবনার দিক হল, রাজনৈতিকভাবে অস্থির দেশসমূহে শ্রম অভিবাসন। গোষ্ঠীগত এবং অভ্যন্তরীন কারনে নিরাপত্তার খাতিরে

বাংলাদেশ সরকার আগষ্ট মাস থেকে লিবিয়ায় অভিবাসন বন্ধ করে দেয়। যদিও এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত ছয় মাসে প্রায় ৫০০০ বাংলাদেশী লিবিয়াতে অভিবাসী হিসেবে যায়। বর্তমানে প্রায় ৪৫০০০ বাংলাদেশী অভিবাসী লিবিয়াতে অবস্থান করছে। এছাড়া এ বছর শুধুমাত্র বেনগাজী শহরেই সংঘাতের মাঝে পড়ে প্রাণ হারায় ৬ বাংলাদেশী। এছাড়া যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইরাকের নাজাফ শহরে আটকে পড়ে মানবেতর জীবন পার করছে ১৮০ বাংলাদেশী কর্মী।

১.৪ দক্ষতা

২০১৪ সালে মোট অভিবাসীর ৩৫.৭৮% দক্ষকর্মী হিসেবে বিদেশে গিয়েছেন (ডিসেম্বর ১০, ২০১৪। ২০১৩ সালে এ হার ছিল মাত্র ১৯.৯৪%। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় দক্ষ কর্মীর সংখ্যা ১৬% বেশি। এছাড়া মোট অভিবাসীর অদক্ষকর্মী ৪৪.৪৮%, আধাদক্ষ ১৬.৯৫%, এবং পেশাগত ০.৪২%। এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু নিবন্ধন এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই নারী কর্মী বিদেশে পাঠানো হয়, সে ক্ষেত্রে যে ৩৫ ভাগ দক্ষ কর্মীর চিত্র দেখতে পারছি, তার একটি বড় অংশই নারী অভিবাসী। পুরুষ অভিবাসনের ক্ষেত্রে এখনো সেই অদক্ষ শ্রমবাজারেই পড়ে আছি।

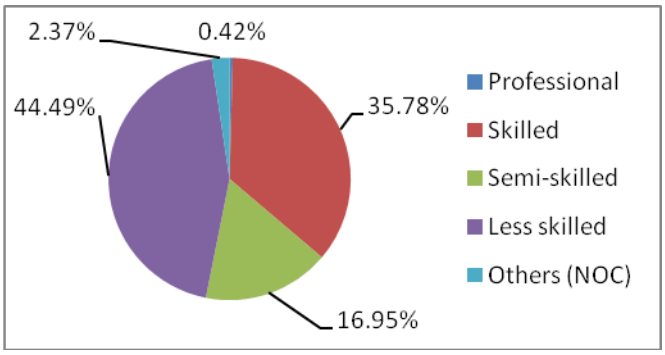

চিত্র: ২০১৪ সালে বাংলাদেশ হতে প্রেরিত অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতার ধরন

১.৫. উৎস এলাকা

অভিবাসীদের মূল উৎস এলাকা হিসেবে এ বছরও প্রথম অবস্থানে রয়েছে কুমিল্লা। মোট অভিবাসনের (৯.৯৯%) শুধুমাত্র এ জেলা থেকে হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানেও যথারীতি গত বছরের ন্যায় চট্টগ্রাম (৬.৬২%)। কুমিল্লা ও চট্টগ্রামসহ বাকি ৮ টি উচ্চ অভিবাসন উৎস এলাকা হলো টাঙ্গাইল (৫.২৭%), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৫.২২%), ঢাকা (৪.৩৪%), চাঁদপুর (৩.৭৭%), নোয়াখালী (৩.২৩%), মুন্সীগঞ্জ (২.৭৯%), নরসিংদী (২.৬৮%) ও ফরিদপুর (২.৬৩%)। অন্যান্য বছরের মত এবারও উত্তরবঙ্গ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করেনি।

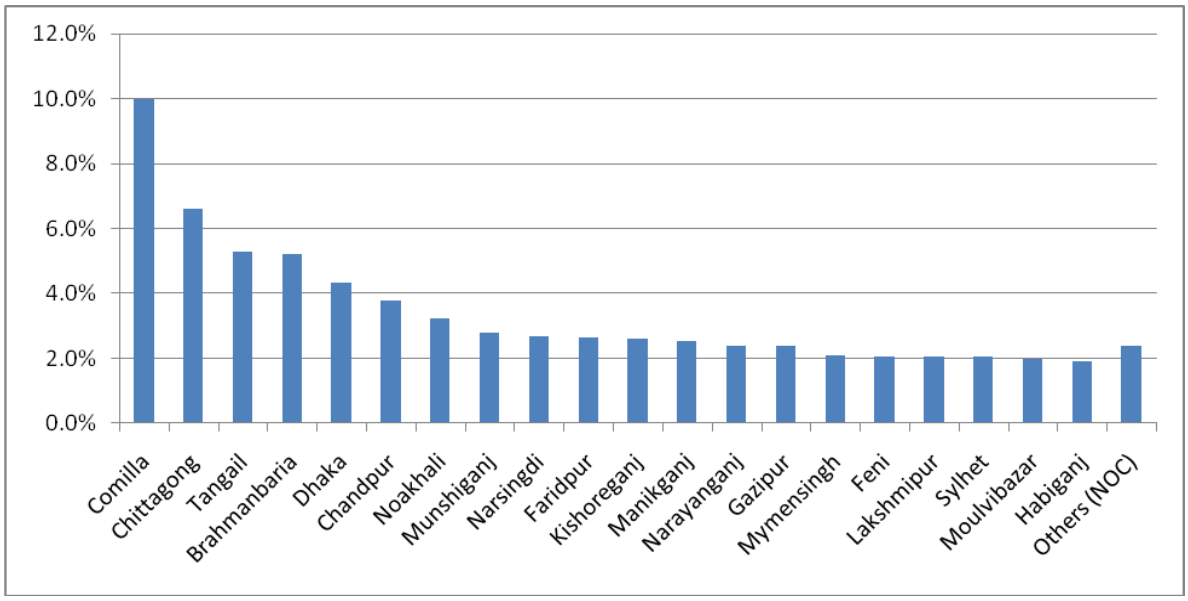

চিত্র: ২০১৪ সালে বাংলাদেশ হতে প্রেরিত অভিবাসী কর্মীদের উৎস এলাকা

যদিও ২০১৩ সালের প্রবাসী কল্যাণ ও অভিবাসী আইনে সমতা বিধানের উল্লেখ রয়েছে এবং মঙ্গাপীড়িত এলাকার জন্য ৪% কোটা সংরক্ষণের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে, সে হিসেবে পরিসংখ্যানের আশানুরূপ পরিবর্তন হয় নি। অভিবাসনের উৎস এলাকার সেরা ২০টি জেলার মধ্যে উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত জেলাসমূহ এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সাইক্লোন এবং নদীভাঙ্গন কবলিত সাতক্ষিরা, বাগেরহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলার মত জেলাসমূহ নেই। অভিবাসন প্রক্রিয়া এখনও সেই প্রতিষ্ঠিত এলাকাগুলো হতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে নওগাঁ থেকে অভিবাসন করেছেন ০.৮৫%, গাইবান্ধা থেকে ০.৪৯%, রংপুর থেকে ০.৪১%, কুড়িগ্রাম থেকে ০.২৮%এবং পঞ্চগড় থেকে মাত্র ০.১১%। দেখা যাচ্ছে বিএমইটি'র উৎস এলাকার তালিকার শেষের ১০টি জেলার ৭ টিই উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত এলাকার। বিএমইটি'র প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় দারিদ্রপীড়িত রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে শ্রম অভিবাসন হয়েছে সবচেয়ে কম।

১.৬ প্রত্যাবর্তিত কর্মী

সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় এ বছর কতজন অভিবাসী কাজ শেষ করে বা কাজের মাঝখানে দেশে ফিরে এসেছে তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। তথ্যের অভাবে বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুণর্বাসনে সরকারী বা বেসরকারী কোন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।

এছাড়া যেহেতু বেশিরভাগ নারীকর্মী গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে, পরবর্তীতে দেশে এসে তারা সে ধরনের কাজ করতে পারেন না। আর নতুন করে অন্য কিছু করার মত যথেষ্ট পুঁজিও তারা বিদেশ থেকে নিয়ে আসে না। তদুপরি, প্রত্যাবর্তিত কর্মীদের কোন জব পোর্টাল না থাকায় তাদের অর্জিত দক্ষতা দেশে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

১.৭ রেমিট্যান্স

২০১৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৪.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স বাংলাদেশে এসেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৪ সালে মোট রেমিট্যান্সের পরিমান দাড়াবে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। এই হার গত বছরের তুলনায় প্রায় ৫.৩% বেশী। এ বছর বাংলাদেশ বিশ্বের রেমিট্যান্স গ্রহণকারী রাষ্ট্রের তালিকায় ৭ম স্থানে অবস্থান করছে।

২০১৩ তে পূর্বের বছরের তুলনায় ২.৭৬% রেমিট্যান্স কমে গিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্য ব্যপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের Monetary Policy র নানা উদ্যোগ যেমন মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে রোড শো , এক্সচেঞ্জ হাউজের শাখা তৃণমূলে ছড়ানো মোবাইল সলিউশানের মাধ্যমে রেমিট্যান্স ট্রান্সফার এবং ট্রান্সফার ফি কমানো সহ নানা উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। এর ফলে অভিবাসন তেমন না বাড়া সত্তেও শুধুমাত্র formal Channel এ রেমিট্যান্স এর প্রবাহ বৃদ্ধি করে রেমিট্যান্স এর একটি ইতিবাচক growth সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এ বছর নভেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশ সৌদি আরব (২১.৬১%)। সংযুক্ত আরব আমিরাত রয়েছে (১৮.৬৮%) দ্বিতীয় স্থানে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৬.১১%) তৃতীয় স্থানে। সৌদিআরবে জনশক্তি রপ্তানিতে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় যেখানে কয়েক বছর পূর্বেও প্রায় ৫০% রেমিট্যান্স আসত তা কমে এখন ২১% এ দাঁড়িয়েছে।

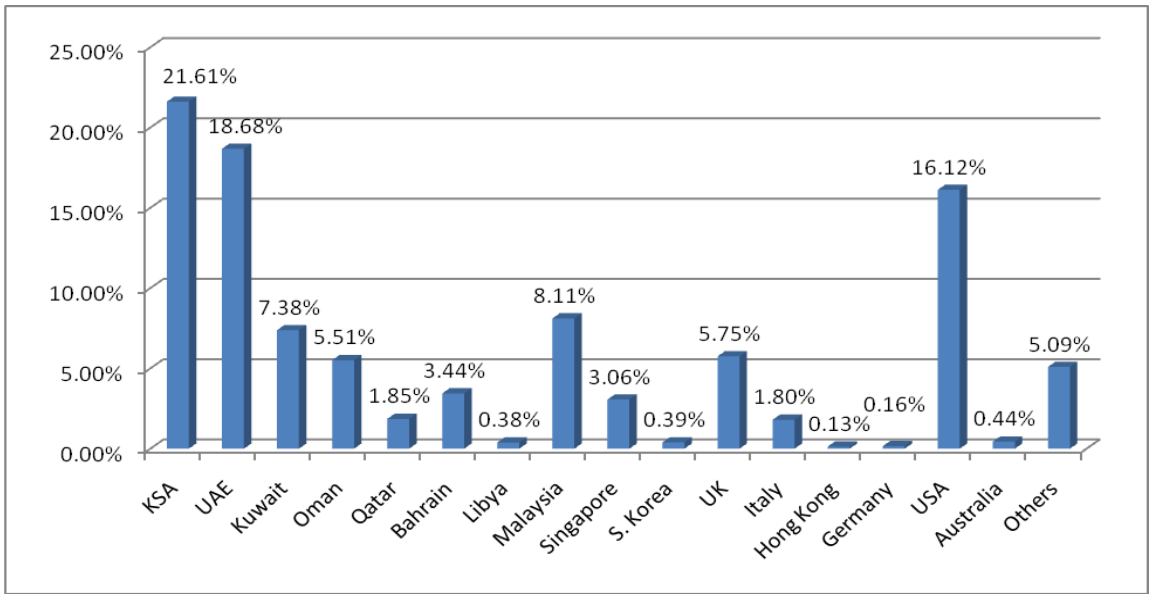

চিত্র: ২০১৪ সালে রেমিট্যান্স প্রেরনকারী দেশসমূহ

এ বছর যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া ও ওমান থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মালয়েশিয়া ও ওমান থেকে গত বছর যথাক্রমে ৭.২২% এবং ৪.৫% রেমিট্যান্স আসে যা এ বছর বৃদ্ধি পেয়ে মোট রেমিট্যান্সের ৮.১১% এবং ৫.৫১% হয়েছে। ২০১৪ সালে সর্বাধিক কর্মী প্রেরণকারী দেশের মধ্যে ১ম তিন রাষ্ট্রের মধ্যে ওমান হতে ৫.৫১%, কাতার হতে ১.৮৫% এবং সিংগাপুর থেকে মোট রেমিট্যান্সের ৩.১% এসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় বার্ষিক রেমিট্যান্সের প্রায় ৩০-৪০% আসে informal পথে (ILO-2014)। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রেরিত মোট রেমিট্যান্স এর পরিমান আরও ৩০-৪০% বেশি ।

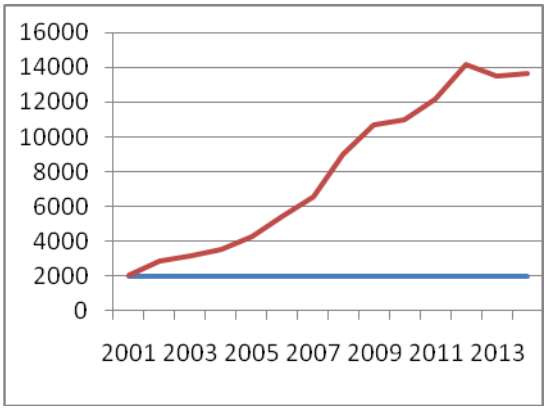

চিত্র: ২০১৪ সালের রেমিট্যান্স প্রবাহ

১.৮ অভিযোগ:

প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষে বিএমইটি দুইভাবে অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে; অনলাইন ও সরেজমিন। রামরুর কারিগরি সহযোগীতায় বিএমইটি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করে এবং চালু হওয়ার পর থেকে এ বছর ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫৪৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে যার মধ্যে ৩১১ টিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, ২২৬ টির শুনানী হয়েছে, ৮টিতে তদন্ত চলমান এবং ঝুলন্ত (Pending) অবস্থায় ৫টি অভিযোগ রয়েছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বরের ৯ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ২৩ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৬ টির শুনানি হয়েছে, ৪টি অভিযোগ ঝুলন্ত অবস্থায় আছে এবং ৩টি অভিযোগের তদন্ত চলমান। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অভিযোগগুলোর কোনটিতেই এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। অভিবাসন খাতে যে অনিয়ম এবং প্রতারণা হয় তার খুব কম অংশ সালিশের জন্য আসে। লক্ষ্যণীয়, ২০১৪ সালে যে ২৩ টি অনলাইন অভিযোগ আসে, তার প্রায় অর্ধেকই সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে (১১টি)। এরপরে রয়েছে ওমান (৫টি), জর্ডান (৩টি), ইরাক (২টি), কাতার ও সুদান হতে ১টি করে অভিযোগ এসেছে। আশংকাজনকভাবে এই ২৩ টি অভিযোগের মধ্যে মাত্র ১টি অভিযোগ নারী অভিবাসীর কাছ থেকে এসেছে। এছাড়া সাধারনভাবে অভিবাসীদের কম্পিউটার জ্ঞানের অভাব, ইন্টারনেটের দূস্পাপ্যতাও অনলাইন অভিযোগ তেমন বেশি না হওয়ার অন্যতম কারন। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৪০ টি সরেজমিন অভিযোগ বিএমইটি তে আসে।

২. ২০১৪ সালে অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

২.১ সমুদ্রপথে অবৈধ অভিবাসন

২০১৪ সালের পুরোটা সময়জুড়ে অবৈধভাবে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। দালালচক্রের দৌরাত্ম এবং নিত্য নতুন কৌশলে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জেলা থেকে এই অভিবাসন লক্ষ্য করা গেছে। একটি বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালয়েশিয়া পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের কারো কাছেই এর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এ বছর জুলাই মাসে ইউএনএইচসিআর-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৮৭,০০০ ব্যক্তি সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া পাড়ি দিয়েছে। গতবছর এ সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৬১ভাগ বেশী। রামরু ২০১২ সালের বার্ষিক অভিবাসন প্রতিবেদনে এ নিয়ে উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছিলো তথাপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করাতে বিষয়টি দিন দিন মারাত্মক আকার ধারন করেছে। সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী এ বছর সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া

যাবার পথে প্রাণহানি ঘটেছে ৫৪০ জনেরও বেশী বাংলাদেশীর। অভিবাসন বিশেষজ্ঞগণ বঙ্গোপসাগর উপকুলের এই সমুদ্র রুটকে ইতিমধ্যে অত্যন্ত বিপদজনক রুট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এসব অভিবাসীকে ফিশিং ট্রলার, গহীন জঙ্গলে, রাবার বাগানে কাজসহ নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ন্যূনতম বেতনে এমনকি অনেকক্ষেত্রে বিনা বেতনেও কাজে বাধ্য করছে। গত ১৯ অক্টোবর ২০১৪ প্রায় ১৭১ জন অভিবাসী শ্রমিককে দক্ষিন থাইল্যাণ্ডের একটি দূর্গম জঙ্গলের রাবার বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে ১১৮ জনই বাংলাদেশী নাগরিক বলে চিহ্নিত করা হয় (বিবিসি)। সেপ্টেম্বর মাসে আরও ৩৭ জন বাংলাদেশীকে আরেকটি জঙ্গল হতে উদ্ধার করা হয়। থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাস হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রায় ৭০০ বাংলাদেশিকে ২০১৪ সালে থাইল্যান্ডের সমুদ্র উপকুল এবং বিভিন্ন জঙ্গল হতে উদ্ধার করা হয়। রামরু-র সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র সিরাজগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলা হতে প্রায় ৪০০০ মানুষ সমুদ্রপথে ট্রলারযোগে মালয়েশিয়া পাড়ি দিয়েছে। যাদের মধ্যে প্রায় ৫০০ মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে এবং ২৫০ জনের মত থাইল্যান্ডের বিভিন্ন কারাগারে আটক রয়েছে। একটি সংঘবদ্ধ দালালচক্র যারা এলাকাতে চিহ্নিত তারা সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকার মধ্যে মালয়েশিয়া নিয়ে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখায় এবং পরবর্তীতে ২,২০০০০ থেকে ২,৫০০০০ টাকা পর্যন্ত দাবী করে। যদি এর অন্যথা হয় তাহলে মাঝপথে সমুদ্রে অমানবিক নির্যান এবং থাইল্যান্ডের উপকুলে ফেলে দেবার ঘটনাও ঘটছে।

সম্প্রতি চট্রগ্রাম বন্দর দিয়ে সমুদ্রপথে অভিবাসনের আরও একটি নতুন অবৈধ রুট তৈরি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, যার গন্তব্য সংযুক্ত আরব আমিরাত। চট্রগ্রাম বন্দর হতে কার্গো জাহাজের ভেতরে লুকিয়ে অভিবাসীদের সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিয়ে যাওয়ার কিছু ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। দ্রুত এ বিষয়ে অনুসন্ধান না চালালে এই রুটটিও মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসনের যে ভয়ংকর রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেই আকার ধারন করতে পারে।

২.৩ G2G ব্যবস্থার অধিনে মালয়েশিয়ায় অভিবাসন

২০১৩ সালের মত এ বছরও G2G ব্যবস্থার অধীনে মালয়েশিয়ায় খুব অল্প সংখ্যক অভিবাসীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সমুদ্র পথে অনিয়মিত অভিবাসীর মালয়েশিয়া যাওয়ার যে চিত্র আমরা পেয়েছি তা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মালয়েশিয়ান নিয়োগদাতাদের কাছে বাংলাদেশী কর্মীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কাঠামোগত ও অন্যান্য জটিলতার কারনে গত ২ বছরে মাত্র ৬১৯১ জন কর্মী প্রেরণ সম্ভব হয়েছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাত্র ৫১৯১ জন কর্মী মালয়েশিয়া গেছেন।

তেনাগানিতার রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, নিয়োগদাতা কর্তৃক ভিসা বিক্রিসহ অন্যান্য কারনে G2G প্রক্রিয়া সফল করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় মালয়েশিয়ায় শ্রমিক প্রেরণ বাড়াতে হলে এই G2G প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন ।

২.৪ জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসন

সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে রামরুর এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, যে সকল এলাকা জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিতে আছে এবং ইতিমধ্যে বিরুপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, যে সকল অঞ্চল হতে প্রচুর আভ্যন্তরিণ অভিবাসন হচ্ছে। এই গবেষণার তথ্য মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে অন্তত ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী তাদের আদি নিবাস থেকে ভিন্ন এলাকায় অভিবাসন করতে বাধ্য হবে। সর্বশেষ আদমশুমারীতে ২৯টি উপজেলায় জনসংখ্যা পূর্বের চেয়ে কমে গেছে। এ ক্ষেত্রে বন্যা, নদীভাঙ্গন, সাইক্লোনের মত দূর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে জনসংখ্যার এ নিম্নমুখী গ্রাফ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রামরু-র আরো একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, অবৈধ অভিবাসনের সাথে জড়িত দালালরা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, ভোলা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, বরিশালের মত জেলার

দূর্গম চরাঞ্চল, নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য দূর্যোগ পিড়ীত এলাকাগুলোকে টার্গেট করেই মূলত এই অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া চলছে । এক্ষেত্রে এসব এলাকায় বৈধপথে আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণ করে এমন সেবাদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম কম। এ কারনেই অবৈধ পথে তাদের উৎসাহিত করা সহজ।

২.৫ উচ্চ অভিবাসন ব্যয়

২০১৪ সালে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগেই ১৭টি উপজেলায় রামরু " Impact of Migration on Poverty and Local development" শিরোনামে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সৌদিআরবে অভিবাসন করতে এ বছর গড়ে প্রায় ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা খরচ করেছেন, যা সর্বোচ্চ ১৬ লাখ টাকা পর্যন্ত গিয়েছে। কুয়েতের ক্ষেত্রে গড়ে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা (সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ), ওমানে ২ লক্ষ ৫০ হাজার (সর্বোচ্চ ৭ লক্ষ), মালয়েশিয়াতে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা (সর্বোচ্চ সাড়ে ৯ লক্ষ) এবং সিঙ্গাপুরে গড়ে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা (সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ) খরচ হয়েছে শুধুমাত্র অভিবাসন ব্যয় বাবদ। অভিবাসন প্রক্রিয়া অনেক বেশি দালাল নির্ভর হয়ে পড়া এ উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ের অন্যতম কারন। সরকারী হিসাব মতে, একজন নারী অভিবাসীর সর্বোচ্চ অভিবাসন খরচ হওয়া উচিত ৩৪,৯০০ টাকা (বিমানভাড়া নিয়োগদাতা বহন করবেন) সেখানে গবেষণার তথ্যে নারী অভিবাসীরা গড়ে প্রায় ৯৪,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করেছেন বলে দেখা গেছে (RMMRU-SDC 2014)। ২০১৪ সালে ILO- র প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়াতে অভিবাসন করতে বিমান টিকেট, মেডিকেল পরীক্ষা, ইনসুরেন্স, সার্ভিস চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ সর্বমোট খরচ হওয়ার কথা ৪০ থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকা। অথচ বাস্তবে, এ রাষ্ট্রগুলোতে অভিবাসন করতে গড়ে প্রায সাড়ে ৩ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে অভিবাসীরা বাধ্য হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব রাষ্ট্রে অভিবাসন করতে গিয়ে বাংলাদেশীরা ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবের চেয়ে প্রায় ৭ গুন বেশি অর্থ ব্যয় করছে (ILO, 2014)।

২.৬ ইরাকে আটকে পড়া ১৮০ বাংলাদেশী

এ বছর বাংলাদেশের ৩৭টি জেলা হতে ১৮০ জন কর্মীকে ইরাকের নাজাফ শহরে আবু তোরাব নামে একটি হাউজিং কোম্পানীতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা হয়। প্রায় ৬ মাস ধরে কয়েকটি এনজিও এসব আটকে পড়া অভিবাসীদের উদ্ধারে নানা চেষ্টা করছে । তাদেও ভাষ্য অনুযায়ী সরকারী মহল ও ইরাকস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এ বিষয়ে কোন সহযোগিতা করছে না । ভুক্তভোগীদের পরিবার অভিযোগ করেন যে, রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায়, পুলিশ ও প্রশাসন দিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে।

২.৭ পুরনো শ্রমবাজারে প্রবেশের চেষ্টা

সরকার পুরোনো শ্রমবাজারে পুনঃপ্রবেশ এবং নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির জন্য বিভিন্নভাবে তৎপর ছিল। সরকারী তথ্যমতে প্রায় ৭ বছর বন্ধ থাকার পর ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কুয়েতে বাংলাদেশের শ্রমবাজার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে। অক্টোবরের ২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে আমালা নামে একটি বেসরকারি কোম্পানীর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে প্রতি মাসে ২০০০ করে নারী শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও আশা করা হয়েছিল পুরুষ কর্মীদের অভিবাসনের উপরে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৪ প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া সফরে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে আগামী বছরের শুরুতে সারাওয়াক প্রদেশের জন্য ১২,০০০ কর্মী নিয়োগের ঘোষণা এসেছে। মূলত

প্ল্যানটেশন সেক্টরে এসব কর্মী নিয়োজিত হবেন। মালয়েশিয়ার মূল অংশ হতে বিচ্ছিন্ন সারাওয়াক একটি দূর্গম এলাকা এবং অত্যন্ত বিপদসংকুল। আশংকার ব্যাপার এই যে, সারাওয়াক প্রদেশে কোন মানবাধিকার সংগঠনের অফিস নেই।

২.৮ নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা

২০১৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে নারী গৃহকর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে (I Already Bought You)। এ রিপোর্টে ৯৯ জন বাংলাদেশি, ফিলিপিনো, ভারতীয়, ইন্দোনেশীয় এবং শ্রীলঙ্কান নারী শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় ।

এই প্রতিবেদনে বলা হয় অনেক নারী শ্রমিকই ভালো পরিবেশে কাজ করছেন কিন্তু পাসপোর্ট আটকে রাখা, শারীরিক নির্যাতন, গৃহবন্দী করে রাখা, বেতন আটকে রাখাসহ বিরামহীন পরিশ্রমের সাথে সাথে খাবার না দেয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা না করার মত বিষয়সমূহ নারী অভিবাসনের জন্য উদ্বেগজনক হিসেবে চিহ্নিত করে।

গণমাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ২০১৪:

এবারের অভিবাসন প্রতিবেদনে রামরু গণমাধ্যমে অভিবাসন বিষয়ক সংবাদ প্রকাশের উপর একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। এ বছর প্রাথমিকভাবে ৪টি পত্রিকার ২০১৩ ও ২০১৪ সালের সংবাদ পর্যালোচনা করে দেয়া যায় যে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সংবাদপত্রসমূহ অভিবাসন ইস্যুকে আরো অধিক গুরুত্বের সাথে পরিবেশন করেছে। ২০১৩ সালে এই ৪টি পত্রিকায় যেখানে অভিবাসন ইস্যুতে ২৯৯টি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশিত হয়, সেখানে এ বছর ৪৩১টি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। সংবাদ পরিবেশনের এ হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৩০% বেশি। প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ বছর ৫৫টি অবৈধ অভিবাসন বিষয়ক সংবাদ ৪টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যা মোট প্রকাশিত সংবাদের ১২.৮%। প্রায় ৬৬টি প্রতারণা, কর্মচুক্তিভঙ্গের মত বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা প্রকাশিত সংবাদের ১৫.৩%। অভিবাসন বিষয়ে নতুন শ্রমবাজার ইস্যুতে পত্রিকাসমূহ সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রায় ৭৫টি শ্রমবাজার বিষয়ক সংবাদ পরিবেশন করা হয়, যা মোট প্রকাশিত সংবাদের প্রায় ১৮%। এর বাইরে জলবায়ু পরিবর্তন এর ফলে সৃষ্ট আভ্যন্তরীন অভিবাসন বিষয়ক ২৬টি সংবাদ (৬%) এবং পাসপোর্ট নবায়ন ইস্যুতে ১৩টি সংবাদ (৪.৪%) প্রকাশিত হয়।

এছাড়া উপসাগরীয় অঞ্চলের অভিবাসী কর্মীদের টার্গেট করে দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি দৈনিক উপসাগরীয় সংস্করণ শুরু করেছে। কাতার, বাহরাইন ও ওমানের অভিবাসীদের লক্ষ্য করে প্রকাশিত এ সংস্করণ অভিবাসী অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সিভিল সমাজকে গন্তব্য দেশে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

৩. আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন:

৩.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যাণ আইন ২০১৩ প্রয়োগ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যাণ আইন ২০১৩ প্রবর্তনের পর ১৫ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এই আইনের অধীনে কোন মামলা আজও হয়নি । ২০১৪ সালে ব্যপক অবৈধ অভিবাসনের ঘটনা ঘটা

সত্ত্বেও এই আইনের অধিনে কোন মামলা হয়নি। যারা এই আইন ব্যবহার করবে তাদের এই আইন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই । এ আইনের অধিনে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা হয়েছে যেমন- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার, থানার ওসি, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবি তারাও এ আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। আইনটির বেশ কিছু অসামঞ্জস্যতাও ধরা পড়ছে।

এই আইনের কোন নন অবস্টেনটিভ ক্লজ নেই। অর্থাৎ এতে বলা নেই যে, অন্য আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন এখন থেকে অভিবাসন বিষয়ে এই আইন-ই প্রাধাণ্য পাবে ।

শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় "করা যাইবে" ব্যবহার করা হয়েছে, "করিতে হইবে" এমন বিধান রাখা হয়নি।

আইনের ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বর ধারাগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে এই ক্ষেত্রেও কিছু মারাত্মক আইনি ত্রুটি রয়েছে । আইনে বলা হয়েছে বিচার প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট করতে পারবে। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতা নেই ১০ বছরের জেল দেয়ার। তাহলে ১০ বছরের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এক দিকে আর অন্যদিকে যার এই ক্ষমতা নেই তার হাতে বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ধারা ৪০ এ বলা হয়েছে "এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হইবে" । মোবাইল কোর্ট সাজা দিতে পারে মাত্র এক বছরের জন্য । তাহলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এক বছরের সাজা দিয়ে অপরাধীকে বাঁচিয়ে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪. অভিবাসীদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমসমূহ

৪.১. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলকে আরও অভিবাসী কেন্দ্রীক করার জন্য রামরু দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছে । কিন্তু বেশিরভাগক্ষেত্রে এ তহবিল মূলত ব্যবহৃত হয়েছে এমন সব কাজে যার অর্থের যোগান হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব বাজেট হতে । রামরুর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০০২-এর বিধিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্রের মহা-হিসাবরক্ষক এর অফিসের মাধ্যমে এই তহবিলের অডিট পরিচালনা করার কথা, কিন্তু বাস্তবে এই তহবিলের আয় ব্যয়ের নিয়মিত কোন অডিট হয় না (RMMRU 2014)। যদিও ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় অভিবাসন পূর্ববর্তী ব্রিফিং প্রদান কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাবস্থা করা এই তহবিলের ব্যায়ের অন্যতম খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে ব্রিফিং সেন্টার স্থাপনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিদেশ-ফেরত অভিবাসীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা করা এই তহবিল গঠনের মূল তিনটি উদ্দেশ্যের একটি হলেও এ নিয়ে তহবিল পরিচালনা বোর্ডের যথাযথ কোন পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় নি। একটি বিশাল অঙ্কের টাকা বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছে। ইস্কাটনে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ভবন এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সমস্ত নির্মাণ খরচও এ তহবিলের টাকায় করা হয়েছে। এমনকি গুলশানের ভাটারায় অভিবাসীদের জন্য ৫০০ ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ কিছুদূর চালিয়ে নেয়ার পর এর কার্যকারিতা বিবেচনা করে তা বন্ধ করে রাখা হয়। বিদেশে প্রায় ১৭ টি মিশনে গঠিত 'লেবার এটাশে' বা শ্রম উইং এর কর্মকর্তাগনের বেতনও এই তহবিল থেকে দেয়া হয়ে থাকে যা সরকারের নিজস্ব রাজস্ব আয় থেকে বহন করার কথা।

৪.২. রিক্রুটিং এজেন্সি

বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে লাইসেন্সধারী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৮৮৪। ২০১৩ সালে যেখানে মাত্র ৭ টি এজেন্সিকে লাইসেন্স দেয়া হয়, সেখানে এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত নতুন করে ৩২ টি নতুন এজেন্সিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ৩৯ টি শাখা রয়েছে এবং শুধুমাত্র ২০১৪ সালেই ১১ টি নতুন শাখা খোলা হয়। অথচ এ বছর বিদেশে যাওয়া প্রায় ৪ লক্ষাধিক অভিবাসীর মধ্যে এ ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বিদেশ যান মাত্র ৩২৮৮ জন। এ বছর সর্বমোট ২৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয়। দেশে ফেরত অভিবাসীদের মধ্যে মোট ৬৬ জন ৭৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা লোন নেয় এ ব্যাংক থেকে। এ বছর অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া ব্যক্তিদের ১ শতাংশেরও কম (০.৮২%) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে ।

৪.৪. মাঠ পর্যায়ে সরকারি কার্যক্রম

জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস অভিবাসীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি'র অধীনে বাংলাদেশের ৪২ টি জেলায় জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (DEMO) রয়েছে। অফিসগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মূল্যায়ণ করে দেখা যাচ্ছে যে এর অর্ধেকেই কোন কর্মকর্তা নেই। মোট পদের প্রায় ৫০ ভাগই শূন্য পড়ে রয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষিত জনবলের যথেষ্ট অভাব এসব জেলা অফিসে। এসব জেলা অফিসের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে কোন অফিস না থাকায় সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না এবং বিএমইটি কেন্দ্রিক যে অভিবাসন কার্যক্রম তা বিকেন্দ্রীকরণেও তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না। যদিও মঙ্গাপীড়িত এলাকায় সরকার ৪% কোটা বরাদ্দ করেছে তথাপি রংপুর ছাড়া কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট এসব জেলাতে কোন কর্মসংস্থান অফিস নেই।

৪.৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিএমইটি'র টিটিসিসমূহ

বিএমইটি'র অধীনে বর্তমানে ৪৭ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে এবং এর মধ্যে ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২০১৪ সালেই চালু হয়। গত বছর সব মিলিয়ে প্রায় ৭৫ হাজার প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। এ বছর নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৯০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। যে হারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণার্থী বাড়ছে, সে হারে প্রশিক্ষক বাড়েনি। এ বছর ট্রেনিং সেন্টারগুলোর জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ৩১ কোটি চৌদ্দ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। ২০১৪ সালে নতুন কোন প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। বর্তমানে ১৩টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে ইন্সট্রাক্টররাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করছেন। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে যদিও প্রতি বছর ২০ হাজারের মত প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সামর্থ্য রয়েছে, এ সংখ্যার চারগুন প্রশিক্ষণার্থী প্রতিবছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ২০১৪ সালে নতুন ফ্রিল্যান্সার কোর্স চালু করা হয়েছে, তবে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সাথে এই কোর্স কতটা মানানসই তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

৪.৬ লেবার এ্যাটাশেঃ

বর্তমাানে ১৭টি শ্রমিক অভিবাসন প্রবণ দেশে লেবার এ্যাটাশে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। রামরুর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অভিবাসীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রায় ৮০%- ই পাসপোর্ট নবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানে বিলম্ব, অভিবাসী বান্ধব নয় এমন স্থানে এ্যাম্বেসী স্থাপন,

এ্যাম্বেসীসমূহে কোন অপেক্ষাগার না থাকা, প্রয়োজনীয় পানীয় জল এবং টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকাসহ সাধারন কাজেও বারবার এ্যাম্বেসী আসার বিড়ম্বনাকে চিহ্নিত করেছে। এ ক্ষেত্রে এসব অভিযোগের সাথে লেবার এ্যাটাশেগণকেই তারা দোষী সাব্যস্ত করে, যদিও এসব সেবার একটি বড় অংশই স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভূক্ত।

বিদেশে আইনী সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোতে আইন উপদেষ্টা না থাকাটা একটি বড় সমস্যা। এর ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইন ও বিচার ব্যবস্থায় একজন অভিবাসীর ন্যায্য বিচার পাওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া অধিকাংশ কর্মকর্তা আরবী ভাষা না জানায় উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে দেন দরবারে যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হয়। লেবার এ্যাটাশে নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও বাংলাদেশ এখনো সেই সনাতনী ধারা বজায় রেখেছে। অন্যদিকে শ্রীলংকা এবং ভারত একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করে সংশ্লিষ্ট ভাষা ও পরিবেশে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসার নিয়োগ দিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে রামরু-র সাম্প্রতি একটি ত্রিদেশীয় গবেষণা থেকে উঠে এসেছে। যে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী বিভিন্ন দেশে কর্মরত সে তুলনায় নিযুক্ত অফিসারও যথেষ্ট অপ্রতুল। নারী অভিবাসীদের জন্য কোন শেল্টার হোমের ব্যবস্থা নেই। যেহেতু নারী অভিবাসনের হার বাড়ছে সেক্ষেত্রে এসব মৌলিক সুরক্ষার ব্যবস্থা বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের নিশ্চিত করা উচিত।

৪.৭: মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান ত্বরান্বিত করা

বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রায় ৬০ লক্ষ প্রবাসী শ্রমিক এখন অনিশ্চিত দিন গুনছে। যেহেতু নভেম্বর ২০১৫ সালের মধ্যে পুরো ইমিগ্রেশন এবং পাসপোর্ট ব্যবস্থাকে মেশিন রিডেবল সিস্টেমে নিয়ে আসা হচ্ছে , সেক্ষেত্রে প্রবাসের ৬০ লক্ষ সাধারন পাসপোর্টধারী কর্মী আগামী বছল নভেম্বরের পরে বিপাকে পড়বে। যদিও প্রায় ৪ বছর ধরে এই পাসপোর্ট ইস্যু করা শুরু হয়েছে, তথাপি এ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র সাড়ে ৪ লক্ষ প্রবাসী কর্মী নতুন ইস্যুকৃত পাসপোর্ট হাতে পেয়েছে। বর্তমানে যেভাবে কাজ চলছে তাতে নভেম্বর ২০১৫ সময়সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ কর্মী নতুন ইস্যুকৃত পাসপোর্ট পাবে (ডেইলি স্টার, নভেম্বর ২০১৪)। এ ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ এবং ইমিগ্রেশন বিভাগ একে অপরকে দায়ী করছে। বস্তুতঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবং সরকারী এজেন্সিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা এ উৎকণ্ঠার অন্যতম কারন। এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিকে ব্যবস্থা না নিলে পুরো অভিবাসন সেক্টর ভয়ংকর সংকটের মুখে পড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

২০১৪ সালে রামরুর গবেষণায় প্রাপ্ত নতুন তথ্য:

২০১৪ সালে রামরু 'Impact of Migration on Poverty and Local Development' শিরোনামে একটি বড় গবেষণা পরিচালনা করে। বাংলাদেশের ৭টি বিভাগে ১৭টি জেলায় এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি একটি প্যানেল সার্ভে, যা অভিবাসন বিষয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, আন্তর্জাতিক অভিবাসী পরিবারসমূহের মাত্র ১৩% দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। যেখানে আমাদের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৬% দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে, সেখানে এই ১৩% নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের একটি সফল চিত্র তুলে ধরছে আমাদের সামনে। নন অভিবাসী এবং আভ্যন্তরীন অভিবাসী পরিবারের ক্ষেত্রে এ দারিদ্রসীমার হার যথাক্রমে ৪০% এবং ৪৭%। এছাড়া আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রবণ জেলাগুলোতে তৈরী হওয়া জনবল সংকট আন্তঃজেলা অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৭৯% উচ্চ অভিবাসন প্রবণ জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য কম অভিবাসন প্রবণ এবং দরিদ্র এলাকা থেকে মানুষকে মৌসুমী কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। এ ছাড়া বিদেশ হতে রেমিটেন্স প্রবাহের কারনে এসব উচ্চ অভিবাসন প্রবণ এলাকাগুলোতে দৈনিক মজুরী অন্যান্য এলাকার চাইতে বেশী বলে তথ্যে উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, পুরো

আন্তর্জাতিক অভিবাসন একটি সূত্রের ম্যাধমে পুরো দেশের স্থানীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং মজুরী বৃদ্ধিতে একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

৪.৮ অভিবাসন খাতে সুশীল সমাজের ভূমিকা

বাংলাদেশের অভিবাসন খাতে সুশীল সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা তৈরী, অভিযোগের মিমাংসা, প্রতারিত অভিবাসীদের অর্থ ফেরত, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

এছাড়া সরকারের সাথে নানা নীতি নির্ধারণে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্সে বাংলাদেশের দাবি দাওয়া উত্থাপনে সরব ভূমিকা রেখে চছে। ২০১৪ সালে ব্র্যাক, বমসা, ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং রামরু একত্রে ৩২৫টি প্রি-ডিসিশান প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান ১৪৭টি অভিযোগের স্থানীয় পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা অভিবাসীকে ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। এছাড়া গ্রাম পর্যয়ে ১১১৫৪টি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় এসব প্রতিষ্ঠান প্রায় ৭২৮৩১৯ জন ব্যক্তিকে অভিবাসন বিষয়ে সচেতন করেছে। এ ছাড়া অভিবাসনের প্রাক্কালে অভিবাসীদের জন্য মোট ১৬৭টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এসব প্রতিষ্ঠান।

দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি এবং নিরাপদ নারী অভিবাসনকে উৎসাহিত করতে ড্যানচার্চ এইড, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এসডিসি, আই এল ও, আইওএম, ইউএন উইমেন-র মত দাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অভিবাসন নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোকে নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশসমূহ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যাণ আইন ২০১৩ এর অসামঞ্জস্যতাসমূহ দ্রুত দূর করা প্রয়োজন। এই আইন সম্পর্কে অভিবাসী কর্মী, পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনজীবিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষনের আওতায় আনতে হবে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের বার্ষিক অডিট নিশ্চিত করা, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং এই তহবিলের মাধ্যমে শুধুমাত্র অভিবাসিদের সরাসরি সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভাটারার মত প্রজেক্টে এই তহবিলের টাকা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছেন, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

বিএমইটি, বিভিন্ন এনজিও এবং কিছু বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দক্ষতার সার্টিফিকেট গুলো জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেলেও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে স্বীকৃতি পায় না। কারন রাষ্ট্রসমূহের দক্ষতা পরিমাপের নিজস্ব মানদন্ডে গিয়ে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত সার্টিফিকেট সমূহ আর কাজ দেয় না। এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের সাথে অনুসরন করা দক্ষতা বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া তা অন্য দেশের সাথেও চালু করা উচিত।

রামরুর রিপোর্ট অনুযায়ী, যেসব এলাকায় অভিবাসন বাড়ছে সেসব এলাকায় দারিদ্রতার হার কমছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্রপীড়িত এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিতে চিহ্নিত জেলাসমূহে অভিবাসীদের নিয়মিত অভিবাসন সুযোগ তৈরী করতে আগামী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিএমইটি ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আগামী বছরের পরিকল্পনায় ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি DEMO office স্থাপন করে অভিবাসনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রবাসে বিশেষ করে নারী অভিবাসীর সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে দূতাবাস গুলোতে ২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি হটলাইন সার্ভিস চালু রাখা, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারী ছুটির দিনে লেবার এ্যাটাশে অফিস খোলা রাখা, নারী অভিবাসীদের জন্য সেফ হোম এর ব্যবস্থাসহ লেবার এ্যাটাশে নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র ক্যাডার সার্ভিস প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে দ্রুত বাস্তবে রূপ দিকে রামরু'র পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হচ্ছে।

উপসংহারঃ

২০১৪ সালের সার্বিক অভিবাসন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত বছরের তুলনায় অভিবাসন মাত্র ১% বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও নারী অভিবাসন প্রায় ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর নতুন কোন শ্রম বাজার উন্মোচিত হয়নি। পুরনো বাজারে পূনঃ প্রবেশের জন্য স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচেষ্ট হয়েছেন । ব্যক্তিগতভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মালয়েশিয়া সফর করেছেন। কিন্তু তারপরও তেমন কোন বড় ধরনের (substantive) অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে অভিবাসন তেমনভাবে না বাড়লেও বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাপক তৎপরতায় formal চ্যানেলে রেমিটেন্স বেড়েছে। বাংলাদেশের অভিবাসন সেক্টরের জন্য সমুদ্রপথে অবৈধ অভিবাসন বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাড়িয়েছে। এর সমাধান করতে না পারলে বৈধ পথে অভিবাসনের সমস্যা আরও গভীর হবে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের ব্যয় কার্যক্রম পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, এখনও এই ফান্ডের খুব সামান্য অংশ অভিবাসীদের সরাসরি সেবা দানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় বাজেট হতে যেই কাজগুলো করার কথা, সেসব কাজই এই ফান্ড থেকে বেশি হচ্ছে। এই ফান্ডের নিয়মিত অডিট হয় না। সরকারী কর্মকর্তাদের তাদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য দায়বদ্ধ করার কোন দৃষ্টান্ত এখানে নেই। প্রশিক্ষন কেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু পর্যাপ্ত প্রশিক্ষক নেই। অভিবাসী কল্যাণ আইন ২০১৩ এর অধীনে কোন মামলা হয়নি। আইন সম্পর্কে সেবাদানকারীদের কোন ধারনা নেই এবং আইনেরও কিছু অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। অন্যান্য বছরের মত সিভিল সমাজের প্রতিনিধিরাও অভিবাসন খাতে নানা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।